হাসান আজিজুল হকের গল্পে সামরিক শাসনকালীন বাস্তবতা

চন্দন আনোয়ার*

১৯৪৭ সালে দেশভাগের মাধ্যমে নবসৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্নেই শাসনতান্ত্রিক সংকট তৈরি হয়েছিল। এই রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিবর্তে সম্পূর্ণ একক ইচ্ছানির্ভর একটি শাসন কাঠামো চালু করেন। গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের যে বীজ তিনি বপন করেন, ধীরে ধীরে তা রীতিতে পরিণত হয়। এই রীতির পথ ধরেই আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খানের মতো সামরিক শাসকেরা পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেছিলেন অবলীলায় ও নির্বিবাদে। সামরিক শাসকেরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার নানা অপকৌশল অবলম্বন করেন। আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের ধারণাটি এ ধরনের একটি অপকৌশল মাত্র। এ সব অপকৌশলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল এ দেশের জনগণ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই ধীরে ধীরে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে রূপ নেয়। দীর্ঘ স্বাধিকার আন্দোলন অবশেষে স্বাধীনতা যুদ্ধে গিয়ে ঠেকে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের। স্বাধীনতার স্থপতির নেতৃত্বে গঠিত হয় গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের সরকার। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের বাস্তবসম্মত সুযোগ তিনি বেশিদিন পাননি। নতুন দেশের শরীরে রক্ত, ক্লেদ, খুন, ঘৃণার গন্ধ না ফুরাতেই দেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে (১৯২০-১৯৭৫) সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ক্ষমতা গ্রহণকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় নানা ষড়যন্ত্র। খুব অল্প দিনের মধ্যেই সেনাবাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করে পরিপূর্ণভাবে। পরবর্তীকালে সামরিক শাসক কর্তৃক রাজনৈতিক দলগঠনের মধ্য দিয়ে চিরদিনের জন্য জাতিকে দ্বিধা বিভক্তির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। সেনাশাসক পাকিস্তানি রীতিকে অনুসরণ করেন এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পুনঃপ্রবর্তন করেন। গণবিচ্ছিন্ন সরকার নিজস্ব মাস্তানবাহিনী ও আমলার উপরে অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল ছিল। ফলে সমস্ত দেশজুড়ে অরাজকতা, লুটপাট, খুন, গুম চলে সরকারের ছত্রছায়ায়। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সুযোগে সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতির সর্বত্র দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সুবিধাবাদীদের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। তারা মূলত পাকিস্তানি শাসকচক্রেরই উত্তরাধিকার। এক দশকের মধ্যেই দেশের অর্ধেকের বেশি পরিবার ভূমিহীন ও আশিভাগের মতো মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যায়। অন্যদিকে অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় কোটিপতির সংখ্যা। বাস্তবতার সরল সমীকরণে ভয়ানক গরমিল সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতার পরে আবার দেশের জনগণকে দেড়দশক ধরে সেনাশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনা করতে হয়। হাসান আজিজুল হকের *পাতালে হাসপাতালে* (১৯৮১) গল্পগ্রন্থের "সাক্ষাৎকার", "পাতালে হাসপাতালে" ও "খনন"; *আমরা অপেক্ষা করছি* (১৯৮৯)' গল্পগ্রন্থের "সম্মুখে শান্তি পারাবার", "পাবলিক সার্ভেন্ট", ও "অচিন পাখি"; *বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের "ভূতের ভবিষ্যৎ" প্রভৃতি গল্পের বিষয় সামরিক শাসনকালীন বাস্তবতা। এসব গল্পে তিনি সামরিক শাসনের প্রকৃত রূপ উন্মোচন করেন।

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি নবাবগঞ্জ কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

বাক্‌স্বাধীনতা

ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার মনস্কামনা নিয়ে সংবিধান-গণতন্ত্র বর্জন করে, স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরতান্ত্রিকতার চরম পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সামরিক সরকার রাষ্ট্রকে এমন একটি নিপীড়ক যন্ত্রে পরিণত করে, যে রাষ্ট্রে মুক্তচিন্তা, স্বাধীন চলাফেরা, এমনকি নারীর সাহচর্য পর্যন্ত একজন নাগরিকের জন্য হয়ে ওঠে সরকার বিরোধী আচরণ, শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কেননা, নারী সৃজনশীলতার প্রতীক। সামান্য সন্দেহে যে কোনো ব্যক্তিকে গোপন জিজ্ঞাসাবাদ থেকে শুরু করে হত্যা পর্যন্ত করা হয়। মুক্তচিন্তার সকল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করায় একটি অনুর্বর সময় অতিক্রম করে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের শাসন বিমূর্ততার আবর্তের মধ্যে পড়ে। এমনি একটি শ্বাসরুদ্ধকর সময়ের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে হাসান আজিজুল হক *পাতালে হাসপাতালে* গ্রন্থের “সাক্ষাৎকার” গল্পটি লিখেছেন। এক সাক্ষাৎকারে লেখক গল্পটির পটভূমি সম্পর্কে বলেন :

> জানি না আমার ব্যাখ্যা পাঠকের কাছে গৃহীত হবে কি না, কিন্তু একটা নতুন আঙ্গিকে গল্প লিখি এইরকম ভেবে আমি সাক্ষাৎকার লিখতে শুরু করিনি। এমন একটা দেশের কথা ভাবি, একটা police state হ্যাঁ বাংলাদেশই, মানুষ কথা বললেই গলা টিপে ধরা হচ্ছে, একটা লোককে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তার সাথে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। এই যে একটা অদ্ভুত অ্যাবসার্ড অবস্থা এটাই যেন আমাদের জীবনের শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেভাবে যেটা হওয়া উচিত মোটেই সেভাবে সেটা হচ্ছে না। আমাদের রাষ্ট্র যন্ত্রটা অ্যাবসার্ডিটিতে দাঁড়িয়েছে বলেই গল্পটা ওভাবে এসেছে। (শাহাদুজ্জামান, ২০১১ : ২২৬)

সূর্যাস্ত দেখার আনন্দ উপভোগরত এক নিরীহ ব্যক্তিকে সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের তিনলোক ধরে নিয়ে যায় নির্দিষ্ট টর্চার সেলে। এতে একটি পুলিশি রাষ্ট্রের সার্বিক চেহারা ফুটে ওঠে। একের পর এক অন্ধকার গলি, পথ, কুঠুরি পাড়ি দিয়ে লোকটিকে নিয়ে যাওয়া হয় এমন একটি ঘরে, যেখানে তীব্র সাদা আলোয় চোখ বন্ধ হয়ে আসে। গোলাম কবির, গোলাম রব্বানী, গোলাম নবী — সরকারের এই তিন গোয়েন্দার নামেই স্পষ্ট হয় তারা সামরিক শাসকের বিশ্বস্ত কর্মচারী, সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নে আত্মসমর্পিত। সূর্যাস্তপ্রেমী লোকটির বিরুদ্ধে অভিযোগ কী তারা স্পষ্ট করে জানে না। তবে লোকটির আচরণে তারা অনুমান করে যে, সে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে অনাগ্রহী। তাদের ভাষায়, বচনে, রটনায়, ইঙ্গিতে বা ব্যবহারে, খেতে, শুতে, উঠতে, বসতে, শ্মশানে, কবরস্থানে, এমনকি নারী সহবাসের সময় উল্টাসিধা কোনোভাবে সরকার ও রাষ্ট্র শাসনের বিরুদ্ধে বা কোনো বিষয়েই অসন্তুষ্টি বা অনীহা প্রদর্শন বা নিজের মত প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। এদিক থেকে সূর্যাস্তপ্রেমী লোকটির বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। যেমন, কোনো এক শনিবারে সে কান উঁচু করে বলেছে, একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে; খেতে বসে দিনকাল খারাপ বলে ক্রুদ্ধ হয়ে মাটিতে চাপড় ফেলে বিড়াল আহত করেছে; গন্ধ পাচ্ছে, গরম লাগছে বা বিষাদ ঠেকছে ইত্যাদি শারীরিক অনুভূতির কথা একবার নয়, একাধিকবার বলেছে। এছাড়া তার বিরুদ্ধে মেয়েমানুষের (লোকটির প্রেমিকা) সঙ্গে রাতে দেখা করার মতো গুরুতর অভিযোগ আছে। এতসব অভিযোগের কারণে বহুদিন গোয়েন্দা নজরদারিতে রেখে শেষে তাকে টর্চার সেলে আনা হয়। প্রথমে তারা লোকটিকে রহমান নামে সম্বোধন করে, কিন্তু তার নাম হচ্ছে হুমায়ুন কাদির। বিপ্লবীরা সময়ে সময়ে নাম পাল্টে ফেলে, ফলে হুমায়ুন কাদিরও নাম পাল্টে ফেলেছে। তারপরে চলে একে একে জবরদস্তিমূলক জবানবন্দি আদায়ের প্রহসন।

কোথায় বসেছিলেন আপনারা? আর কার কার আসার কথা ছিলো? তাদের নাম-ধাম বলুন। আমাদের কাছে নিশ্চিত খবর আছে, দুদিন আগে বেলা দুটোর সময় আপনারা বলেছিলেন, ভেবে দেখতে হবে। কি ভেবে দেখতে চেয়েছিলেন আপনি? অতো ভাবাভাবির কি আছে? তারও আগে একদিন সন্ধেবেলায় একজন যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করে, এই বিষয়ে আপনার মত কি? সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিয়ে আপনি কি না বললেন, চিন্তা করে দেখতে হবে। একবার ভেবে দেখবেন, একবার চিন্তা করে দেখবেন—ওসব বেয়াদবি কে করতে বলেছে? জানেন না সব ভাবনাচিন্তা আপনার অনেক আগেই করা হয়ে গেছে? কি? জানেন নাকি? চুপ করে রইলেন যে! (হাসান, ১৯৮৫ : ৩৬)

হুমায়ুন কাদিরের নিয়তি নির্ধারিত ছিল। ফলে খুব বেশি জিজ্ঞাসাবাদ বা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তাকে সময় দেবার প্রয়োজন মনে করেনি; অথবা, অপরাধ প্রমাণের বা শনাক্তকরণে কোনো প্রকার ভুল হচ্ছে কি না তা যাচাই করার দরকার মনে করেনি গোয়েন্দা বাহিনী। কেননা, সুপরিকল্পিত দমননীতির অংশ হিসেবে হুমায়ুন কাদিরকে শনাক্ত করা হয়েছে। তার ভবিতব্য নিশ্চিত মৃত্যু। অবশ্য হত্যার পূর্বমুহূর্তে দু-মিনিট সুযোগ দেয়া হয় মুক্তভাবে ভাবার জন্যে। হুমায়ুন কাদিরের দু-মিনিটের ব্রাকেটবন্দি ভাবনার ভেতর দিয়ে উঠে আসে মানব সভ্যতার আদি ইতিহাস, যেখানে আক্রোশ-ঘৃণা-ভালোবাসা আছে, অন্ধকার আছে, তারপরেও মানুষের প্রতিই তার আস্থা বা বিশ্বাস প্রধান।

ক্ষমতার পথ নিষ্কণ্টক রাখতে হুমায়ুন কাদিরকে নির্বিকারভাবে খুন করা হয়। এরপরেও বাকি থেকে যায় অনেক কিছুই। কারণ কোনো কিছুরই শেষ নেই। তাই, হুমায়ুন কাদিরের শেষ আস্থা মানুষের উপরেই। কারণ, মানুষের কণ্ঠ স্তব্ধ করে, গণতন্ত্র ও সংবিধানকে নির্বাসনে পাঠিয়ে, অস্ত্রের জোরে ত্রাস-আতঙ্কের সৃষ্টি করে চিরস্থায়ীভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়।

গল্পটিতে বিচারের নামে যে প্রহসন তৈরি হয় এবং একটি শ্বাসরুদ্ধকর বিমূর্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তাকে ফ্রানৎস কাফকার "The trial" গল্পের প্রধান চরিত্র ব্যাংকের কেরানি জোসেফ কে-র বিচারের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাথে তুলনা করা যায়। এছাড়া স্মরণে আসে জ্যাঁ পল সার্ত্রের "The wall" গল্পটি। সন্ত্রাসবাদী নেতা র‍্যামন গ্রিসকে খুঁজে বের করতে তার তিনবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। দ্রুততার সাথে প্রহসনের বিচারও সম্পূর্ণ করা হয়। ফাঁসির রায় ঘোষিত হয় কিন্তু দুর্জ্ঞেয় কারণে সেই রায় বাতিল করা হয়। হঠাৎ দেখা যায়, আরো দশজনকে নতুনভাবে গ্রেফতার করা হয়। শেষে র‍্যামন গ্রিস গ্রেফতার হলে তাদের মুক্তি মেলে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে চরিত্রগুলোর মানসিক অবস্থা ও শারীরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রতিটি শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্ত এমনভাবে চিত্রিত করা হয় যা পাঠককে উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখে, তারপরে কী হচ্ছে ভেবে শঙ্কিত-সন্ত্রস্ত মন নিয়ে পাঠক অপেক্ষা করে। হাসান আজিজুল হকের "সাক্ষাৎকার" গল্পের সূর্যাস্তপ্রেমী মানুষটি তিনজনের দ্বারা ধৃত হবার পরেই সেই উৎকণ্ঠা শুরু হয়। কী হতে যাচ্ছে ভেবে পাঠকের প্রতিটি মুহূর্ত কাটে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে।

চিকিৎসাব্যবস্থা

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের অর্থ, বিত্ত, ক্ষমতা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমষ্টির কল্যাণার্থে ব্যয় হবে। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর বাস্তবতায় দেখা যায়, তা থেকে অনেক দূরে চলে গেছে রাষ্ট্র। এক বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণি ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাও পূরণ হয় না। গ্রাম ও শহর উভয়েরই ভিতরে জমে উঠে অন্তর্লীন সংকট, বৈষম্য, বিশৃঙ্খলা। এই বাস্তবতায় রাষ্ট্রের সাথে শ্রেণিভেদে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে লেখা হয় হাসান আজিজুল হকের "পাতালে হাসপাতালে" গল্পটি। প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ কৃষক, যাদের আধুনিক ভাষায় শস্যের কারিগর বলা হয়, যারা দেশের খাদ্য ও অর্থের প্রধান যোগানদাতা, তাদের দরিদ্রতা ও চিকিৎসার পরিহাসতুল্য বাস্তবতা এবং বিপরীতে দারোগা-পুলিশ, পাতি-বুর্জোয়া বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সুখ-প্রাচুর্যের উপরে আলো ফেলে স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেন লেখক।

রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব সকল নাগরিকের চিকিৎসা সুনিশ্চিত করা। এই দায়িত্ব সরকারের জন্য যেমন ন্যায়ভিত্তিক, তেমনি সাংবিধানিকও বটে। কিন্তু সরকারের অমনোযোগ, ভুলনীতি, দুর্নীতি, অপ্রতুল বাজেট, অপ্রতুল বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও ডাক্তারদের রাজধানীমুখী হবার তীব্র প্রবণতার কারণে মানুষের মৌলিক চাহিদা চিকিৎসা নিয়ে বাণিজ্য শুরু হয়। বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিকে বিপুল অর্থ ব্যয় করে চিকিৎসা নেবার সামর্থ্য নেই দেশের ৯০ ভাগ মানুষের। ফলে ভগ্ন স্বাস্থ্য, রোগজর্জর দুর্বল শরীর নিয়ে বেঁচে আছে কৃষক, শ্রমিক, নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তের বিরাট অংশ। বিত্তশালীরা অর্থ দিয়ে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পায় দেশে এবং বিদেশে। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থে লালিত ডাক্তার সরকারি পদে আসীন থেকে চরম অবহেলা প্রদর্শন করে সরকারি হাসপাতালের রোগীদের প্রতি। অবশ্য, এক্ষেত্রে রাষ্ট্র তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সরকারি হাসপাতাল তৈরি করে রাষ্ট্র কিছু সুবিধাভোগী মানুষের অর্থ লুটের সুব্যবস্থা করে দিয়েছে। উৎপাদনের প্রধান কারিগর কৃষক-শ্রমিকের মৃত্যুর দায়িত্ব যেন তাদের হাতে দিয়েছে। তাই, সরকারি হাসপাতাল প্রকাশ্যে মানুষ মারার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলেও সরকারের কোনো তদারকি নেই। বাঁচার আশা নিয়ে যে অসহায় মানুষগুলো আসে অধিকাংশ সময় তারা লাশ হয়ে ফিরে যায়। ডাক্তার ও কর্মচারীদের সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা, ঔদাসীন্য, স্বার্থচিন্তার কারণে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা একটি আইওয়াশ ছাড়া কিছুই নয়। একদিকে গ্রামবাংলার মানুষজন চিকিৎসার অভাবে মারা যায়, অন্যদিকে সরকারি ডাক্তারদের বিরাট অংশ নানা ছলে রাজধানীতে থেকে যায় বছরের পর বছর। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা ও লুটপাটের যে রীতি তৈরি হয়েছে, মানুষের চিকিৎসা ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়েছে ভয়াবহভাবে। হাসান আজিজুল হক তাঁর ''পাতালে হাসপাতালে'' গল্পটিতে এ সবকিছুই প্রতিফলিত হয়েছে। তালপুকুর গ্রামের দরিদ্র কৃষক জমিরুদ্দি তার পায়ে বেঁধা বাবলা কাঁটা নাপিতের সাহায্যে বের করতে গিয়ে গ্যাংগ্রিনে আক্রান্ত হয়। তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় আনা হয় সরকারি হাসপাতালে। কিন্তু রোগীর প্রতি এমারজেন্সির দায়িত্বরত চিকিৎসকের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। টেলিফোনে বউ, সিনেমা, পে-স্কেল ইত্যাদি নিয়ে আলাপে সে ব্যস্ত। পে-স্কেলের অর্থ বেশি পেতে হলে উৎপাদন বাড়াতে

হবে জমিরুদ্দিদের, তাই আলাপের এক ফাঁকে মুমূর্ষু জমিরুদ্দির দিকে তাকিয়ে বলে, 'কি চাচা, উৎপাদন বাড়াবে? উৎপাদন?' (হাসান, ১৯৮৫ : ৪৬)

বহু চেষ্টা তদবিরের পরে জমিরুদ্দির সাথে আসা দুই কৃষক এমারজেন্সির লোকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে বটে, তবে তার কথা, 'এখানে এনেছো কেন?' (হাসান, ১৯৮৫ : ৪৭) তারা ভাবে, হয়তো ঘুষ নেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে এমন আচরণ। কিন্তু তাদের ঘুষ দেয়ার সামর্থ্য নেই। হাসপাতালের সার্জারি প্রধানের চোখে পড়ে জমিরুদ্দি। কিন্তু কী হয়েছে তা জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি বলেন, 'এ বাঁচবে না। যা হবার হয়ে গিয়েছে। এখন কিছু করার নেই।' (হাসান, ১৯৮৫ : ৫০) একজন মানুষের বেঁচে থাকার মতো মৌলিক বিষয় নিয়ে একজন ডাক্তার বা কর্মচারীর এমন নির্মম উপহাস পরিস্থিতির বাস্তবতাকে চিহ্নিত করে। এই বাস্তবতা আরো স্পষ্ট হয় খাবারে মলের গন্ধ, পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাসপাতালের সব রোগী দেখে ফেলা, অবশ না করে গরু জবাই করার মতো শরীরে অস্ত্র চালনা এবং মেঝেতে রোগী থাকায় ডাক্তারের মানবিকতা বিবর্জিত আচরণের মধ্য দিয়ে।

> হসপিটালের একটা ডিসিপ্লিন নেই? মাটিতে রুগী থাকবে? কাল সব বিদায় করে দিন।
> ওরা কেউ হেঁটে আসেনি স্যার। সবাইকে স্ট্রেচারে করে দিয়ে গেছে।
> তাহলে স্ট্রেচারে করে বাইরে নর্দমায় ফেলে দিয়ে আসুন। মরবে তো সবাই—অতো কায়দা করে মরতে হবে না।...
> এক ঘণ্টার মধ্যে যে রুগী মরবে না, তাকে যেন এখানে ভর্তি না করা হয়। এক ঘণ্টার মধ্যে মরা চাই। (হাসান, ১৯৮৫ : ৫৪)

স্বাধীন-উত্তকালের বাংলাদেশের সার্বিক বিশৃঙ্খলা চিকিৎসার মতো প্রধান বিষয়টিকেও পীড়িত করে। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা মূলত এক প্রকার প্রহসন। হাসান আজিজুল হক এই প্রহসনের স্বরূপ উন্মোচন করেন নৈর্ব্যক্তিক অবস্থানে থেকে নির্বিকার রিপোর্টারের মতো। কিন্তু গল্পটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনো রিপোর্ট হয়ে যায়নি। গল্পের একটি বীক্ষা আছে। আর এটি শুরু হয় জমিরুদ্দির হাসপাতালে প্রবেশের পরেই। সরকার ক্ষমতার স্বার্থে মুষ্টিমেয় কিছু সুবিধাভোগী মানুষের (যাদের একটি বিশেষ অংশ সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার-কর্মচারী) সুবিধার দিকটি সর্বাগ্রে বিবেচনায় রাখে। অন্যদিকে আছে জমিরুদ্দির মতো কৃষক-শ্রমিক, যারা গ্রামের চিকিৎসার সামান্য সুযোগটুকুও না পেয়ে শহরের সরকারি হাসপাতালে আসে চিকিৎসার আশা নিয়ে, আবার লাশ হয়ে ফিরে যায় ডাক্তার-কর্মচারীর কর্তব্যের অবহেলা, অব্যবস্থাপনার কারণে। তাদের অভিভাবক নেই। গ্যাংগ্রিনে আক্রান্ত অংশ না কাটলে দুদিনের মধ্যে জমিরুদ্দি মারা যাবে, কিন্তু আরো মুমূর্ষু রোগী মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে, যাদের অপারেশন না করে ডাক্তার জমিরুদ্দির অপারেশন করতে পারবেন না। অর্থাৎ বিনাচিকিৎসায় মৃত্যুই জমিরুদ্দির ভবিতব্য বা নিয়তি। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন বা বিপ্লবের বিকল্প নেই। গল্পের রাশেদ চরিত্রটি সেই বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আর এই বিপ্লব এখনি শুরু করা উচিত। তার ভাষায় :

> তুমি মধ্যবিত্ত, তুমি পাতি-বুর্জোয়া, বিপ্লব তোমার শত্রু নয়, কিন্তু তোমার দেরি সইবে, বিপ্লব আসতে দেরি হলে তুমি অপেক্ষা করতে পারো—কিন্তু ওর, এই ক্ষেতমজুরের এক মুহূর্ত বিলম্ব সইবে না, বিপ্লব তার এক্ষুণি দরকার, এক্ষুণি। এক্ষুণি বিপ্লব হলে সে বাঁচে, বিপ্লব হতে দুদিন দেরি হলে সে দুদিন আগে মরে যায়। তাকে এই কথাটি বুঝিয়ে দাও, সে সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের পক্ষে লড়ুয়ে হয়ে যাবে। (হাসান, ১৯৮৫ : ৬৪)

রাশেদের এই বিপ্লবীচেতনা লক্ষ্যভেদী নয়। কারণ, ক্ষেতমজুর-শ্রমিককে শিখিয়ে দিলেই তাৎক্ষণিক বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলবে, এটি বাস্তবসম্মত কোনো পদক্ষেপ নয়। বিপ্লবের জন্য সময় ও শক্তির প্রয়োজন হয়, যা অর্জন করতে হয় দীর্ঘ সংগ্রাম-সাধনা-শিক্ষার মাধ্যমে। মাথায় গোলমাল শুরু হয়ে গেলে রাশেদ এই ধরনের ম্যাজিক বিপ্লবের কথা চিন্তা করে। এই কারণে, জমিরুদ্দির অপারেশনের দাবি নিয়ে ডাক্তারের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে ক্রোধ প্রকাশ করেও কোনো ফল হয় না। যে মানবিক ভাষা ও বন্ধনের ঐক্য দরকার বিপ্লবের জন্য, তা রাশেদের বিপ্লবচিন্তায় নেই। এ কারণেই, সে জমিরুদ্দির স্ত্রী-সন্তানের বোবা যন্ত্রণাকে ধরবার ভাষা খুঁজে পায় না। মৃত্যুফাঁদ হাসপাতালে মরার চেয়ে বাড়িতে মরা ভালো। এ জন্য জমিরুদ্দিকে বাড়ি নিয়ে যেতে চায় তার স্ত্রী। এটিও এক ধরনের প্রতিবাদ, এমনকি শিক্ষিত বিপ্লবী রাশেদের প্রতিবাদের চেয়ে যেন শক্তিশালী। রাশেদের ক্রোধকে ডাক্তার পাত্তা দেননি, কিন্তু জমিরুদ্দিকে বাড়ি নিয়ে যাবার কথায় আতঙ্কে কেঁপে ওঠেন।

জমিরুদ্দি বা তার পরিবার-পরিজনদের সাথে রাশেদের কোনো প্রকার আত্মিক যোগ নেই। কিন্তু বিপ্লবের দীক্ষামন্ত্র নিয়েছে সে, বিপ্লব তার করতেই হবে। শিক্ষিত তরুণ তার বিপ্লবীচেতনার তাত্ত্বিক দিকটাই জানে, প্রায়োগিক বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞাত। তার এই বিপ্লবের ধারণা বাস্তবতার কাছে টিকতে পারে না, তেমনি তার মানবিক সহানুভূতিও মূল্যহীন। রাশেদ সম্পর্কে লেখক এক সাক্ষাৎকারে বলেন :

> সেই ষাটের দশকে সশস্ত্র আন্দোলন, অ্যাকশন মুভমেন্ট, গ্রামকে স্বাধীন করে দাও, চীনের মাও সেতুংয়ের প্রদর্শিত পথই আমাদের পথ—এই সময়টা সেটা তোমরা চিন্তাই করতে পারবে না। যেটা আমরা যৌবনে ও মধ্য বয়সে দেখেছি। ওই সময়ে তরুণ। খুব ব্রিলিয়ান্ট তরুণরা এ-দেশে ও পশ্চিমবঙ্গে একটা অসাধারণ স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। তাদের অনেক কিছুই শিখিয়ে দেওয়া হত। রাশেদের ওই কথাগুলো হচ্ছে শেখানো বুলি। এবং একসময় দেখো রাশেদ 'আহা! বিপ্লব' বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে তার কারণ তো আসলে এই যে, সে বুঝতে পারছে—এই কথাগুলো আসলে কোথাও গিয়ে লাগছে না। এটা কিন্তু লেখকের প্রত্যয়জাত বক্তব্য নয়। রাশেদ নিজেই বোঝে যে এটা কোথাও দাঁড়ায় না। (আহমাদ, ২০১১ : ৩৬)

সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র বৈষম্যমূলক ও শোষণমূলক স্থাপনা তৈরি হয়ে আছে—যা স্বাধীনতার পরে আরো শক্তিশালী ও দৃঢ় ভিত পেয়েছে—তাকে সমূলে বিনাশ করে নতুন কোনো ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলে পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ নেই। রাশেদের মতো শিক্ষিত তরুণদের প্রবল আন্তরিকতা ও সহানুভূতি থাকার পরেও জমিরুদ্দিদের মুক্তির কোনো উপায় তারা বের করতে পারেনি। ফলে তারা বা তাদের পার্টি যত সংগ্রামই করুক না কেন, কোনো লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে না।

একটি হাসপাতালকে প্রতীক করে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবক্ষয়ের চিত্রটিকে তুলে এনেছেন লেখক। রাশিয়ার গল্পকার চেখভের "ছয় নম্বর ওয়ার্ড" গল্পের সাথে গল্পটির বেশ সাদৃশ্য আছে। চেখভ তাঁর গল্পে রাশিয়ার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবক্ষয়, বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতির সামগ্রিক চিত্রকে তুলে আনেন। তাঁর গল্পের ডাক্তার আন্দ্রে ইয়েফিমিচ-এর সঙ্গে হাসান আজিজুল হকের গল্পের সার্জারি ডাক্তারের, বিপ্লবী রাশেদের সঙ্গে ইমান দমিত্রিচের যথেষ্ট মিল আছে। হাসপাতালের চরম নৈরাজ্য, দুর্নীতি, লুটপাট, অন্যায়-অবিচার নীরবে সহ্য করেন ডাক্তার আন্দ্রে ইয়েফিমিচ। একসময় তিনি বিবেকপীড়নে আক্রান্ত হন এবং প্রচণ্ড মানসিক চাপে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। শেষে, তাকে নিজেকেই হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় এবং পরিণামে মৃত্যুর অনিবার্য নিয়তিকে বরণ করে নিতে হয়। আপাদমস্তক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত, মানবিকতা-বিনষ্ট, অবক্ষয়িত একটি সমাজে একজন বিবেকবান মানুষের বেঁচে থাকা কঠিন। দুজন লেখকের সমাজ ও রাষ্ট্র দুই রকমের, তাই দুটি গল্পে সংকট ও অবক্ষয়ের মাত্রাগত পার্থক্য আছে। কাহিনি ও চরিত্রায়ণে প্রচুর মিল থাকলেও বাস্তব পরিণতি স্বতন্ত্র। চেখভের গল্পের ব্যাপ্তি ও গভীরতা হাসান আজিজুল হকের গল্পে নেই। বস্তুত, তিনি চেখভের কৌশলটাকেই গ্রহণ করেছেন মাত্র।

সরকারি প্রকল্প, মাস্তানবাহিনী ও আমলা

স্বাধীনতার পরে সৃষ্ট রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, ক্ষমতা দখলের অসুস্থ প্রতিযোগিতা, সেনাবাহিনীর ক্ষমতালিপ্সার কারণে সদ্যভূমিষ্ঠ দেশ ও দেশের মানুষের উপরে নেমে আসে অকল্পনীয় দুর্ভোগ। অস্ত্রের জোরে জবরদস্তি করে ক্ষমতায় বসার কারণে উন্নয়নের প্রায় সর্বাংশই চলে যায় সরকারের মদদপুষ্ট বিশেষশ্রেণির ঘরে। ফলে দেশের মানুষ ক্রমশ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হতে হতে শ্রমজীবী অর্ধাহারী বা অনাহারী মানুষে ভরে যায় গ্রামবাংলা। অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য সরকার স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে 'খাল-খনন প্রকল্প (১৯৭৬)' গ্রহণ করেছিল। আর এই স্বেচ্ছাশ্রমে যারা নিয়োজিত হয় তারা সকলেই ভূমিহীন দিনমজুর। খাল-খনন করে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও এই শ্রমিকদের তাতে সামান্য অধিকারও থাকবে না। অথচ, কৌশলে তাদের মগজে সবুজবিপ্লবের ধারণা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সামরিক শাসক খুব দ্রুত জনগণের দ্বারা গৃহীত হয় এবং অধিক উৎসাহে তারা এই বিপ্লবের সাথে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই বিপ্লবের ভেতরে যে শাসক ও মদদপুষ্ট বিশেষশ্রেণির স্বার্থ ও প্রতারণা জড়িয়ে ছিল, শ্রমজীবী মানুষ তা ধরতে পারেনি। হাসান আজিজুল হক *পাতালে হাসপাতালে* গ্রন্থের "খনন" ও *আমরা অপেক্ষা করছি* গ্রন্থের "সম্মুখে শান্তি পারাবার" গল্পে এই ভেজাল-বিপ্লবের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। "খনন" গল্পে সবুজবিপ্লব নিয়ে রিপোর্ট করতে গ্রামে-আসা সাংবাদিক শাহেদ বাংলাদেশের গ্রাম সম্পর্কে বলে,

> উফ, শালার গেরামবাংলা, বঙ্গ আমার, জননী আমার। হয় ন্যাড়া মাঠ চিত্তির হয়ে পড়ে আছে, না হলে বানে ডুবে আছে, গ্রামে ঢুকলে শালা পোকামাকড়ের মতো ন্যাংটো কিটকিটে কালো মেয়ে পুরুষ বাচ্চা এসে ছেঁকে ধরে, সব ব্যাটার হাতে একটা করে তোবড়ানো এনামেলের বাটি, কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, বানে ভেসে যাচ্ছে, মড়কে সাফ হয়ে যাচ্ছে—আর ইদিকে তোদের জাতীয় অর্থনীতি, গণতন্ত্র, ভেঙ্কিতন্ত্র, রাহাজানিতন্ত্র—আর বলিস না দিকিন। (হাসান, ১৯৮৫ : ৭৫)

বস্তুত, ঢাকা থেকে আসা সাংবাদিকেরা সুবিধাভোগী শ্রেণিরই অংশবিশেষ। যে কারণে, গ্রামের পরিবেশ যেমন তাদের শরীরে সহ্য হয় না, তেমনি গ্রামের অসহায় নিরন্ন মানুষের যন্ত্রণা বা প্রয়োজনকেও তারা ধরতে পারে না। তাই, ভুখা শিশুকে কোলে নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ভুখা যুবতীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাতেও তাদের ভিতরের লিপ্সা জেগে ওঠে। খননস্থলে গিয়ে সুবিধাভোগী লোকটির সাথে তারা তর্কে জড়ায় বটে, এমনকি, শিরদাঁড়া বাঁকা করে শরীরের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করে দাঁতে দাঁত ঘষে মাটির ঢালা মাথায় তুলছে যে শ্রমিক তার প্রতি সামান্য সহানুভূতিও প্রদর্শন করে, কিন্তু তারা শ্রেণিগণ্ডির বাইরে আসতে পারে না। "পাতালে হাসপাতালে" গল্পে যেমন গ্রামের নিঃস্ব ক্ষেতমজুর শ্রমিককে শহরের হাসপাতালে এনে গ্রাম-শহরের বৈষম্য ও দুই অংশের মানুষের বেঁচে থাকার প্রশ্ন, রাষ্ট্রের সুখ-সুবিধা গ্রহণের প্রশ্ন ইত্যাদির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন পাঠককে, "খনন" গল্পে তেমনি এই প্রশ্নগুলোই এসেছে আরো শানিতভাবে। শহরের দুই সাংবাদিককে গ্রামের নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রাষ্ট্রের সুফলভোগী মানুষদের ভোগবাদী চেহারা উন্মোচন করেন লেখক।

বাস্তবে, যে নিষ্ঠুরতা আর বৈষম্যের মধ্যে গ্রামের মানুষদের বসবাস, সেই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তো অনেক দূরের প্রশ্ন, তার মুখোমুখি দাঁড়ানোর মতো সামান্য সৎ সাহসও নেই সাংবাদিক শাহেদ ও তার সহযোগীর। মদ আর নারীতে অভ্যস্ত শাহেদ পরিস্থিতির বীভৎসতা থেকে মুক্তির জন্য প্রথমে মদ, পরে নারী প্রার্থনা করে, কিন্তু কোনোটিই আর তাকে মুক্তি দিতে পারে না। নিজের ভিতরে উত্থিত সমস্ত ক্রোধ, আক্রোশ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ স্পৃহা তথা জেগে-ওঠা ক্ষণিকের বিবেককে চিরতরে স্তব্ধ করে নিজের বহমান জীবনকে অক্ষত রাখার চেষ্টাও তার ব্যর্থ হয়। নিজের ছদ্মবেশী চরিত্রের খোলস উন্মোচন হতে হতে নেমে আসে একেবারে পতনের প্রান্তে। আকাঙ্ক্ষিত ভুখা যুবতীকে দরজা থেকে তাড়িয়ে দিতে গিয়ে শাহেদ যেভাবে আর্তনাদ করে ওঠে, তাতে স্পষ্ট হয়, পরিস্থিতির চাপে সে কতটা অসহায়। প্রতারণা, লোভ-লুটপাট, সুখ-সম্পদ অর্জনের রুগ্ন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত শাহেদের ভিতরে জাগ্রত চৈতন্য নিতান্তই সাময়িক। কারণ, ওরা জানে, দেশ নিজের পায়ে দাঁড়াবে, তবে দেশের পা থাকবে গরিব মানুষের বুকের উপরে।

সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় নানা ছলে কৌশলে গরিব মানুষের শ্রম ও শক্তি সামান্য পুঁজিকে শুধুমাত্র খাদ্যের বিনিময়ে ক্রয় করে নেয় মন্ত্রী-আমলা থেকে শুরু করে গ্রামের ফড়িয়া, টাউট, মাস্তানরা। জনগণের উন্নতির নামে খাল-খনন ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প গ্রহণ করে তার প্রায় সবটাই আত্মসাৎ করে সরকারের লোকেরা। এই আত্মসাতের প্রক্রিয়াগত পার্থক্য থাকলেও সর্বত্রই সরকারের মদদপুষ্টরাই এতে জড়িত ছিল। এই বাস্তবতাই ''সম্মুখে শান্তি পারাবার'' গল্পের বিষয়। টানা তিনদিন অনাহারে কাটানোর পরে ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর কৃষক পিতা ও তার পুত্রের চোখে অন্ধকার নেমে আসে। তারা পরস্পর দ্বন্দ্বে জড়িয়ে খিস্তিখেউড় করে। ক্ষুধার্ত পিতা ও তার সন্তান পরস্পরের মৃত্যু কামনা করে। তারা এভাবে বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায় না। তারা চারদিক থেকে শোষণ ও বৈরিতার শিকার হয়। প্রকৃতির বৈরী আচরণ তো আছেই, সাথে সমাজ-রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রকশ্রেণির প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও বঞ্চনাসহযোগে ক্রমশ কর্মচ্যুত, বাস্তুচ্যুত ও শেকড়চ্যুত হতে হতে তারা একসময় নিরন্ন ভিখারিতে পরিণত হয়। তাদের শ্রমে-ঘামে-

রক্তে হৃষ্টপুষ্ট হয় শাসক ও শোষকশ্রেণি। তারা মানুষের বেঁচে থাকার মতো মৌলিক বিষয়কেও রাজনীতি ও বাণিজ্যের মধ্যে ফেলে দেয়। খাল-খননের মতো প্রহসন তৈরি করে বিপ্লব বলে চালিয়ে দেয়। ক্ষেতমজুর-কৃষক-শ্রমিক সরল বিশ্বাসে নিজেদের শ্রমশক্তি প্রয়োগ করে সেই বিপ্লবে, কিন্তু তাদের জীবনে বিপ্লবের কোনো ফল আসে না। অধিকন্তু এই খাল-কাটা কর্মসূচি গরিব মানুষের জীবনে 'গোর খোঁড়া' কর্মসূচিতে পরিণত হয়। অন্যদিকে, বিপ্লবের নামে নানা সুযোগ-সুবিধা কুক্ষিগত করে একটি বিশেষ শ্রেণি ধনবান হয়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের নাম করে নিজ দলের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের পকেট ভারি করার প্রকল্প নিয়েছিল সরকার। কিন্তু সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ ও দমন-পীড়নের ভয়ে সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকে।

> বাপ দুহাত মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে বলে, খাল কাটার কথা কি কচ্ছিস?
> কচ্ছি চুরি করে সব ফাঁক করে দেচ্ছে তো!
> দেচ্ছে তো তোর কি? গরমেন্টের বিরুদ্ধে বলতেছিস? গরমেন্ট তোর সাঙর ভেঙে দেবেনে দেহিস ক্যানো?
> আমার আবার সাঙর কোয়ানে যে ভাঙবে। আমার কথা ভারি শুনিতেছে গরমেন্ট।
> গরমেন্টের বিরুদ্ধে বলতে নেই বাপ। সোনা আমার, যাদু। শুয়োরের বাচ্চা—বলবি তো মরবি। (হাসান, ১৯৯৫ : ৬৩)

সরকার ও সরকারি দলের চরম স্বেচ্ছাচারিতা, শক্তিপ্রদর্শন, সম্পদ লুটপাটের উপদ্রবে মাৎস্যন্যায়ের মতো সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সর্বত্র ঠাঁই করে নেয় বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম ও জবরদস্তি। টানা তিনদিনের ক্ষুধায় টিকতে না পেরে কৃষক তার শেষ সম্বল একবিঘা জমি মাত্র এক হাজার টাকায় বিক্রি করে সরকারি দলের এক নেতার কাছে। পাঁচ শ টাকা দিয়ে দলিল নেবার সময় নেতা বলে, 'এইহানে এটটা সই করো দিনি—গরমেন্ট আবার কি? এহানে আমিই গরমেন্ট, হ হ, পার্টির কথা কচ্ছি।' (হাসান, ১৯৯৫ : ৬৪) পার্টির নামে নৈরাজ্য ও অরাজকতা করে গ্রামবাংলার সাধারণ নিরীহ মানুষের জীবন-সম্পদ কিভাবে কুক্ষিগত করে তার দৃষ্টান্ত দেখা যায় গল্পের শেষে। দুপুরে পাঁচ শ টাকা দিয়ে জমির দলিল নিয়ে গেল যে নেতা, সে-ই রাতে অস্ত্রসজ্জিত দল নিয়ে হামলা করে ছিনতাই করে সেই টাকা। টাকার সাথে তারা লুট করে কৃষকের আঠারো বছরের তরুণী কন্যা ও পুত্রবধূর সম্ভ্রম। হ্যাজাকের আলোয় পিতা-পুত্রের সামনে ধর্ষণ করে। এই দৃশ্য অসহায় পিতার চোখ সহ্য করবে না বলে তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করে :

> আমার মেয়ে সোনার তৈরি, ছেলের বৌ আমার সোনার বউ। আমার চোখ দুটো তোরা বেঁধে দে—বেঁধে দে—শুয়োরের বাচ্চারা, চোখ দুটো বাঁধ—ঘরের মেঝে থেকে হিম ধাতব চিৎকার ওঠে—ভয়ানক লাথি এসে পড়ে ভিজে মাটিতে। মেয়ের গায়ে জামা ছিল না। একটানেই তা চড়চড় করে শাড়ি ছিঁড়ে খসে পড়লো।
> বাপ চোখ বন্ধ করে, খোলে, আবার বন্ধ করে। চোখ দুটো বেঁধে দে রে—এই চক্ষু দুটি—মগজের মধ্যে কথাগুলো টগবগ করে ফুটছিলো। তখনি বোঝা গেল, চোখ বাঁধার আর কোন দরকার নেই। চোখ খোলা থাকলেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। (হাসান, ১৯৯৫ : ৬৭)

ধর্ষণের এই মর্মান্তিক দৃশ্য একাত্তরের পাকিস্তানি বাহিনী বা রাজাকার বাহিনীর নারী ধর্ষণের বর্বরতাকেও হার মানায়। সাধারণ মানুষের জীবন-সম্পদ-সম্ভ্রমের নিরাপত্তা দেবার দায়িত্ব

যে রাজনৈতিক দল ও সরকারের, তাদের হাতেই তারা সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ। যে পিতাকে সাক্ষী রেখে তার যুবতী কন্যা-পুত্রবধূকে ধর্ষণ করে, যে পুত্রের সামনে তার যুবতী বোন-স্ত্রীকে ধর্ষণ করে, আঘাত-প্রতিরোধ তো দূরের কথা মুখ ফুটে রা শব্দটি করার শক্তি পর্যন্ত নেই তাদের। রাষ্ট্র, সরকার, দল, সরকারের আইন-আদালত, আইন প্রয়োগকারী বাহিনী সব কিছুই সাজানো নাটকের মতো তামাশা, অর্থহীন, দুর্বলকে শোষণ করার জন্য সবলের হাতিয়ার। এই গল্পে সরকারের মাস্তানবাহিনীর হাতে নিরন্ন অসহায় কৃষকের সর্বস্ব হারানোর মর্মন্তুদ কাহিনির মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার বাস্তবচিত্র উন্মোচিত হয়।

সরকারের মাস্তানবাহিনীর দৌরাত্ম্য শুধুমাত্র গ্রামবাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। শহরের ক্ষমতা পরিচর্যাকারীরাও নিরাপদ নয় তাদের হাতে। সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হলে সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ের ক্ষমতার অংশীদারেরা নিজেদের নিরাপদ ভাবেন। বাস্তবে, এই মাস্তানবাহিনীর কাছে সবকিছুই অনিরাপদ, শক্তিহীন, অপ্রতিরোধ্য। হাসান আজিজুল হকের *আমরা অপেক্ষা করছি* গ্রন্থের ''পাবলিক সার্ভেন্ট'' গল্পে সরকারের প্রধান আমলা মামুন রশীদের স্ত্রী সরকারের মাস্তানবাহিনী দ্বারা অপ্রত্যাশিতভাবে ধর্ষিত হয় তারই চোখের সামনে। "সম্মুখে শান্তি পারাবার" গল্পে কৃষক স্বামী তার স্ত্রীকে ধর্ষণের সময় নির্বিকার দর্শক ছিলেন মাত্র, মামুন রশীদও একই রূপ নির্বিকার দর্শক মাত্র। অথচ, সে সামরিক শাসকের প্রধান মন্ত্রণাদাতা। বিশ বছরের সরকারি চাকরিতে বরাবরই তার সম্মানের আসন। ক্ষমতায় যে দল বা যে-ই আসুক না কেন, মামুন রশীদ সর্বদাই সক্রিয় থেকেছে নিজের মর্যাদার অবস্থানকে আরো পোক্ত করতে। সে জানে, ক্ষমতার উৎস কোথায় এবং ক্ষমতাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। তার অবস্থান ক্ষমতার এত নিকটবর্তী যে, ইচ্ছে করলেই ক্ষমতার সেই রাজাসনটি সে ছুঁতে পারে, ফাঁকা থাকা অবস্থায় দু-একবার সেখানে বসতেও পারে। কিন্তু এই কাজ সে কখনো করে না। কারণ, সে জানে, এই আসনে বেশিদিন কেউ টেকে না। ক্ষমতা অন্ধ, তার নাক-মুখ-চোখ নেই। কখন যে কার দখলে, সেই রহস্যে না জড়িয়ে মামুন রশীদ টিকে থাকতে চায়, ক্ষমতার স্বাদ স্থায়ী করতে চায়। তার ভাষায়,

> জনগণ অস্থির, আর আমরা স্থির। ক্ষমতা? ক্ষমতা আবার কি? কাগুজে বাঘের আবার গর্জন কি? ওর লেজ তো সলতে, যে আসছে ফস করে দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে দিচ্ছে, কুটকুটুনির শখ হয়েছে, থাকো সিংহাসনে বসে। ক্ষমতাটা ঠিক কোথায় আছে, সে আমরাই জানি। (হাসান, ১৯৯৫ : ৭২)

"পাবলিক সার্ভেন্ট" গল্পটির রচনকাল ১৯৮৩-১৯৮৫। স্পষ্টতই বলা যায়, সামরিক বাহিনীর প্রধান, পরে শাসকের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিটির অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল এবং কতিপয় আমলা ও নামসর্বস্ব রাজনৈতিক দল ভেঙে সামরিক সরকারের ছত্রছায়ায় রাজনৈতিক দলগঠনের মধ্য দিয়ে তার গণতন্ত্রে ফেরার প্রহসন এ গল্পের বিষয়। দেশের ভেতরে সৃষ্ট গণঅসন্তোষ, আন্তর্জাতিক বিশ্বে, বিশেষ করে সাহায্যদাতা দেশগুলোর প্রচণ্ড চাপে সামরিক শাসকের বোধোদয় ঘটে যে, জনগণের কাছে না গিয়ে এভাবে সেনাবাহিনী দিয়ে দেশের ক্ষমতায় বেশিদিন টিকে থাকা অসম্ভব। সারা পৃথিবী যখন গণতন্ত্রের পথে হাঁটছে, তখন জনগণের কণ্ঠ অস্ত্রের মুখে স্তব্ধ করে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করাও সম্ভব নয়। সেনাবাহিনীর শক্তির পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগঠনের মধ্য দিয়ে সেনাশাসক নিরংকুশভাবে ক্ষমতা আয়ত্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত

হন। তার স্বগতোক্তিতে তা স্পষ্ট, 'কোন বিকল্প নেই, জনগণের কোন বিকল্প নেই, জনগণের কাছে আমাকে যেতেই হবে।' (হাসান, ১৯৯৫ : ৮০)

প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের সমাবেশ করে সামরিক সরকার নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটায়, যাদের প্রধান অংশই সরকারের মাস্তানবাহিনী, যারা এতকাল সরকারের ছত্রছায়ায় নানা অপকর্মে জড়িত ছিল। প্রায় সত্তরটির মতো নামসর্বস্ব ও ব্যক্তিসর্বস্ব দলের সুবিধাবাদী কিছু নেতা, যাদের বড়ো অংশ জেলফেরত, নতুন রাজনৈতিক দলে যোগ দেয় । অতিশয় দুর্নীতিবাজ বলে এই সামরিক সরকারই তাদের জেলে প্রেরণ করেছিল। সামরিক শাসক দুর্নীতিবাজদের নিজের দলভুক্ত করেন এই যুক্তিতে যে, মানুষ বদলায়। আর দাঁত-নখ না থাকলেও বুড়ো বাঘ বাঘই। সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে সরকার প্রধানের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বা জ্ঞান প্রায় কিছুই নেই, কিন্তু কিভাবে ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে হয় সে কৌশল তার ভালো জানা। দলের উপরের দিকে কিছু বুড়ো নেতার আগমন ঘটানো হয় বটে, কিন্তু তার মূল ভরসা ও শক্তি যুবকবাহিনী। তাই, দলের আত্মপ্রকাশের অনুষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় যুবকবাহিনীর হাতে, এমনকি তারা সরকার প্রধানের নিরাপত্তার দায়িত্বও গ্রহণ করে। রাষ্ট্রপ্রধান মানবদরদি ও দেশদরদি বক্তৃতার খই ফুটিয়ে যখন মঞ্চ থেকে বিদায় নেন ঠিক তখনি যুবকবাহিনী বোমা-ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উপস্থিত সকলের ভিতরে একটি আতঙ্ক সৃষ্টি করে। পাঁচ হাজার মানুষ যখন একসঙ্গে প্রাণ ভয়ে ছুটছে, তখন মূর্তিমান যুবশক্তি মামুন রশীদের স্ত্রী শায়েলাকে জোরপূর্বক সাততলা বাড়ির পুবদিকের অন্ধকারে নিয়ে ধর্ষণ করে। মামুন রশীদ বাধা দেবার চেষ্টা করে, ওরা কাঁধে আঘাত করে বলে, 'আবে আমলার বাচ্চা, বাড়িতে যা, খানিকবাদে আইস্যা নিয়া যাস, এক আধটা ফ্রি সার্ভিস দিলে কি হইবো—পইচা যাইবো তর বৌ?' (হাসান, ১৯৯৫ : ৮৪)

অপ্রতিরোধ্য অপ্রত্যাশিত এই আক্রমণের জন্য মামুনকেই দায়ী করে শায়েলা। সন্ধ্যার আলো-আঁধারির মধ্যে দশ হাত দূরে থাকা মামুন রশীদের চেহারাটা আলোর তরঙ্গে বিলীন হবার মতোই শায়লার চোখ থেকে বিলীন হতে শুরু করে। ধর্ষণের মুহূর্তে তার ক্রোধ-ঘৃণা-জিজ্ঞাসা কোনোটিই ধর্ষকদের প্রতি থাকে না, তার সবটাই গিয়ে পড়ে মামুনের উপরে। 'ভুরু কুঁচকে, সাপের মতো নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে, গলার দুপাশের রগ ফুলিয়ে কদর্য একটা ভঙ্গিতে শায়েলা প্রাণপণে চেয়ে রইলো মামুনের দু চোখের দিকে।' (হাসান, ১৯৯৫ : ৮৫)

মামুনের মতো আমলাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এই যুবকবাহিনী গড়ে উঠেছে। এতকাল সাধারণ মানুষের উপরে অত্যাচার চালালেও কোনো প্রতিকার পায়নি। অবৈধভাবে ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে জনবিচ্ছিন্ন সরকার এই মাস্তানবাহিনীকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। এই বাহিনীর শক্তির এতটাই বৃদ্ধি ঘটে যে, সরকারের প্রধান আমলার স্ত্রীকে তার চোখের সামনে গণধর্ষণেও কোনো বাধা থাকে না, বরং তাদের জন্য পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে।

এই যুবশক্তি নানারকমের সরকারি প্রকল্পের অর্থ লুটপাট করে একদিকে যেমন অর্থশালী হয়ে ওঠে, অন্যদিকে অস্ত্র হাতে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করে সামগ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটি বিশৃঙ্খল ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। সেই পরিস্থিতির সুবিধা গ্রহণ করে নারী ধর্ষণ থেকে শুরু করে হেন অপরাধ কর্ম নেই তারা করেনি। অবৈধভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার

স্বার্থে জনবিচ্ছিন্ন সামরিক সরকার এই মাস্তানবাহিনীকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। মামুন রশীদের মতো আমলাদের বুদ্ধি ও কর্মতৎপরতায় তাদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটে।

শায়েলা এতকাল নির্বাক্যে মামুনের ক্ষমতার কাছে, স্বেচ্ছাচারিতা আর অবাধ নারীসঙ্গ উপভোগের পঙ্কিলতার কাছে পরাজয় মেনে এসেছে। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে এতদিন একটা আড়াল ছিল। শায়েলা ধর্ষিত হবার মধ্য দিয়ে উভয়ের মাঝখান থেকে সেই আড়াল বা পর্দাটা খসে পড়ে। ধর্ষিতা শায়েলা পরাজয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। বিরাট এক ব্যক্তিত্ব নিয়ে মামুনের মুখোমুখি দাঁড়ায় শায়েলা। সরকারি আমলা হিসেবে আলোচনার মধ্য দিয়ে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করে অসম্ভবকে সম্ভব করার ব্যাপারে মামুনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাও এক্ষেত্রে কাজে আসে না। রাষ্ট্রের সমগ্র জনগণের ফরমানদাতা এই অপরিমেয় শক্তিধর আমলার প্রতি শায়েলার মতো সামান্য নারীর এমন অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রদর্শনের স্পর্ধা মামুন রশীদকে শঙ্কিত করে, কিন্তু অস্থির বা অধৈর্য করে না। ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি অনুকূলে আনার জন্যে লম্বা ছুটি নিয়ে বাসায় থাকে সে। জীবনে শুধু একবারের জন্য ঘটে যাওয়া ঘটনাটিকে নানা যুক্তিতে মামুন যতই দুর্ঘটনা বলে স্বাভাবিক করে দেখার চেষ্টা করে, ততই কঠিন থেকে কঠিনতর ভাষায় আক্রমণ করে শায়েলা। সে সরকারের এই শক্তিশালী আমলার বাইরের চাকচিক্য, আভিজাত্য, ভালোমানুষি ও শাসনের গর্জনের উল্টোপিঠে জীবন্ত হয়ে থাকা লাম্পট্য, অপরিচ্ছন্নতা, কলুষ-পঙ্কিলতা ও প্রতারণার পর্দা খুলে দেয়।

> স্ত্রীর সম্মান বলে তোমার কাছে কিছুই নেই। আমি সেটা ভালোই জানি। তোমার নিজের সম্মানও তোমার কাছে এতটুকু নেই। একটা কেন্নো বা একটা গিরগিটির সঙ্গেও তোমার তুলনা করা চলে না সেটা সারা দেশের কেউ না জানলেও আমি জানি।...
> কাগজের মতো শাদা হয়ে গেল শায়েলার মুখ। দুটো চোখ বিস্ফারিত—মণির উপরে নিচের শাদা অংশটা বেড়িয়ে এসেছে—চোখের সামনে যেন বিকট দানব দেখছে সে। কেন কথা বলতে এসেছো তুমি, আমাকে তুমি কি বুঝাবে? আমি কি পোশাকের নিচে তোমাকে কোনোদিন দেখিনি? তোমার নোংরা জঘন্য চেহারাটা? এখনো আমি তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাই। জামাকাপড়ে যতোই নিজেকে ঢেকে রাখো। (হাসান, ১৯৯৫ : ৭৬-৭৭)

দীর্ঘ বঞ্চনা, অবহেলা আর তাচ্ছিল্যের শিকার শায়েলার ভেতরে জমে-ওঠা ক্ষোভ, ঘৃণা, প্রতিবাদ ভাষা পেল এই প্রথম। তাই, মামুনকে ক্ষমতার শীর্ষ থেকে একেবারে মাটিতে নামিয়ে আনা তার পক্ষে সম্ভব হয়। ক্ষমতা ব্যবহার করে, লাভ-লোভ-কৌশল করে নানান ফাঁদে ফেলে অগণিত নারীকে মামুন তার নিজের বিছানায় টেনে আনে। এর পাল্টা প্রতিদান হিসেবে শায়েলার জন্যে এই ভবিতব্য অপেক্ষা করছিল যে, কোনো একদিন সেও শক্তিশালী কোনো পুরুষের লিপ্সার শিকার হবে। কিন্তু মামুনের জন্য সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি হচ্ছে, মাত্র দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছে এই দৃশ্য। সেই সাথে, তার অবস্থানও নির্ণীত হয়। মামুন রাষ্ট্রের বেতনভোগী চাকর মাত্র। কিন্তু তাকে প্রদেয় ক্ষমতা সে জনগণের সেবায় ব্যবহার করেনি, নিজের ও সরকারের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার কাজে ব্যবহার করেছে। মামুনের দায়িত্ব জনগণের জীবন-সম্পদ-সম্ভ্রম রক্ষা করা, কিন্তু তারই প্রত্যক্ষ আনুকূল্যে সমগ্র দেশে সরকারের মাস্তানবাহিনী জনগণের উপরে পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

স্বাধীনতার এক দশকের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত দারিদ্র্যপীড়িত দেশের প্রধান হর্তা-কর্তা হয়ে যায় সরকারি আমলারা। রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতার ঘনঘন রদবদলের সুযোগকে ব্যবহার করে একশ্রেণির আমলা করেনি এ হেন কাজ নেই। আশির দশকের শুরুতেই তাদের লাম্পট্য ও সম্পদলিপ্সার প্রকোপ বাড়তে শুরু করে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে সামরিক সরকারের অতিমাত্রায় আমলা-নির্ভরতার কারণে জনগণের সেবক আমলারা শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাদের নারীলিপ্সা আর ভোগবিলাস মধ্যযুগের রাজা-বাদশাহ-সুলতানদেরও হার মানায়। সচিবালয়ে প্রকাশ্যে সুন্দরী নারীর যাতায়াত বেড়ে যায়। ''পাবলিক সার্ভেন্ট'' গল্পটি ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারির ৩ তারিখে ঘটে যাওয়া একটি বাস্তব কাহিনি নিয়ে লেখা। পুলিশি প্রহরার মধ্যে প্যান্ডেলের ভেতরে স্বামীর পাশে-থাকা একজন নারীকে তুলে নিয়ে এভাবে ধর্ষণের ঘটনা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু সমসাময়িক বাস্তবতায় তা সম্ভব ছিল। এ প্রসঙ্গে আবু জাফরের মন্তব্য :

> এরশাদের আমলের স্বৈরাচারী শাসনের বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যিক অবস্থায় নিপতিত দেশ-কাল-পাত্রের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে, সরকারের পোষিত গুণ্ডাবাহিনী কর্তৃক হত্যা, ধর্ষণ, নির্বারিত লুণ্ঠনের পরেও পুলিশ প্রশাসনের চরম ঔদাসীন্য এবং বহুক্ষেত্রে উপর থেকে নির্দেশ থাকার কারণে ঐ সব গুণ্ডা ও মাস্তানদের প্রোটেকশন দেবার জন্য পুলিশ তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ যে কতোটা নগ্ন ও নির্লজ্জ হতে পারে সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে, শায়েলার ধর্ষিত হবার ঘটনাটি অবাস্তব মনে হতে পারে। (আবু জাফর, ১৯৯৬ : ১২৮-২৯)

সামরিক শাসকরা, যারা পরে রাজনৈতিক দল গঠন করে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে চেয়েছে, তরুণ প্রজন্মকে রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে দেবার মধ্যে দিয়ে ছাত্রসংগঠনের নামে অস্ত্রধারী মাস্তানবাহিনী গঠন করেছিল। পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও এই চর্চার অনুপ্রবেশ ঘটে। হাসান আজিজুল হকের *বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প*গ্রন্থের "ভূতের ভবিষ্যৎ" গল্পটি তরুণ প্রজন্মের অপরাজনীতি নিয়ে লেখা। ধীর শান্ত স্বভাবের স্বল্পভাষী তরুণ টিটন ঠাণ্ডা মাথার খুনি, নৃশংসতার অবতার। সে যে নেতার হাতিয়ার সেই নেতা নিষিদ্ধ বিপ্লবী কোনো রাজনৈতিক দলের নেতার মতো প্রায় অন্ধকার একটি ঘরের এক কোণে নির্জনে বসে থাকে ফুলের গালিচা পেতে। ফুলের গালিচায় বসে থাকলেও তার শরীরে মৃত মানুষের গলিত লাশের গন্ধ। প্রথম পরিচয়ে নেতা সম্পর্কে কথকের পর্যবেক্ষণ সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অধঃপতনের বাস্তবতাকে দারুণভাবে মূর্ত করে তোলে।

> ঠিক গিরগিটির মতো লম্বা ঘাড় কাৎ করে আমার দিকে চেয়ে আছে, চোখে পলক পড়ছে না। আস্তে আস্তেই, রক্তচোষা গিরিগিটির মতোই, তার ঘাড়ের কালো পাতলা চামড়া টকটকে লাল বেগুনি হয়ে উঠল। সে দুতিনবার তার সরু লম্বা গোলাপি জিভ টপাৎ করে বের করে আনল, আবার মুখে ঢুকিয়ে নিল। কথা বলার আগে সে দুতিনবার এই রকম করল, তারপর যেন হঠাৎ কথা বলতে পেরে খুশি হয়ে গদগদ গলায় বলে, কাজকম্ম কিছু করতে পারবা? আর লোকটা চোখের পাতা পড়ে না দেখি—চাউনিটা কেমন বুজে আসছে, তবু চোখের পাতা বন্ধ করতে পারছে না কেন? (হাসান, ২০০৭ : ৫৮)

অত্যন্ত দক্ষ এই রাজনৈতিক নেতা টিটনের মতো টপটেররদের গডফাদার, তাই প্রকৃত প্রস্তাবটা দিতে তার কোনো প্রকার ভণিতা, সময়ক্ষেপণ বা সৌজন্য প্রকাশের দরকার হয় না। কপালে একটা গুলি বা বুকের বা দিকে সরু একটি চাকু ঢোকানোর মতো অতি সামান্য সময় ব্যয়ের মাধ্যমে কাজ করতে হবে কথককে। নেতার ভাষায় :

> এখন খুব কাজ আছে। নির্বাচন আসতিছে সেপতেম্বরে। তিতন, একবার ওছুদঘরে নিয়ি যা—বড়ি, ক্যাপসুল, সিরিঞ্জ, পিচকিরি এইসব একতু দেখিয়ে দে, ছাওছ বাড়বে, ভয় কেতে যাবে। বড় বড় চিকিচ্ছে, অপারেশন করতে, ওরে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিতে হবে। যা নিয়ে যা। (হাসান, ২০০৭ : ৫৮)

বলা বাহুল্য, এই নেতার ওষুধঘর মানে অস্ত্রখানা। দেয়ালে দেয়ালে টাঙানো রাইফেল, বন্দুক, পিস্তল, রিভলবার, চাইনিজ কুড়াল ইত্যাদি বিচিত্র সাইজের অস্ত্র ও অসংখ্য বাক্সে থরে থরে সাজানো গোলাবারুদ ভর্তি ঘরটি একটি যুদ্ধ জয়ের পরিমাণ অস্ত্রের সংগ্রহশালা। জনগণের শক্তিতে নয়, এই অস্ত্রের জোরেই নির্বাচনে জেতার ব্যবস্থা, তাই স্বাধীনতার পরে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অস্ত্র সংগ্রহের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নামে। সাথে অর্থ দিয়ে টিটনের মতো টেররদের কেনার প্রতিযোগিতাও আছে। নেতা প্রথম দিনেই কথকের হাতে দশহাজার টাকার বান্ডিল ধরিয়ে দেয়। তরুণ বয়সে এই বিপুল পরিমাণ টাকার লোভ ক্রমশ পেশাদারিত্বে পরিণত হয়। তখন শুধু এই নেতা নয়, অন্য নেতার কাছ থেকে টাকা নেবার ফাঁদে পড়ে কথক। ফলে সম্ভবত প্রথম নেতার আদেশে বা টিটন নিজের পথ পরিষ্কার রাখার উদ্দেশ্যে কথককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে বিচ্ছিন্ন করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বিচ্ছিন্ন অঙ্গগুলোকে জ্বলন্ত ইটভাটায় পুড়িয়ে নিঃশেষ করে। কিন্তু নিঃশেষ হয় না। দেহঘর না থাকায় মানুষ হিসেবে পুনরুত্থানের সুযোগ নেই। তাই কথক ভূতে রূপান্তরিত হয়। যে কারণে কথককে খুন করে টিটন বাহিনী, সেই একই কারণে টিটনও খুন হয়।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্ররা সাধারণত রাজনৈতিক দল বা নেতার ক্ষমতা প্রাপ্তির সিঁড়ি বা চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নেতার ছত্রছায়ায় টেন্ডারবাজি, নারী ধর্ষণ, খুন, লুটপাট ইত্যাদি অপকর্মে জড়িয়ে এমনই মাস্তান হয়ে ওঠে যে, দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও ওদের কাছে নস্যি। এমনকি, পেশাদার মাস্তান-ছিনতাইকারীও তাদের কাছে পাত্তা পায় না। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের "ফেরারী" গল্পে ছাত্র-মাস্তানদের 'পুলিশের বাপ' বলেছেন। ওদের দৌরাত্ম্য ও ক্ষমতা কি ভয়ংকর রূপ লাভ করেছে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ক্লাব-হোটেল থেকে ভদ্রলোকেরা গাড়ি নিয়ে বের হলে সেই গাড়ি আটকে চাঁদাবাজি করে এবং 'মাগীউগি পছন্দ হইলে ময়দানের মইদ্যে লইয়া হেইগুলিরে লাগায়।' (ইলিয়াস, ১৯৯৯ : ৬৩) আশির দশকের প্রথমে সামরিক শাসক, পরে স্বৈরশাসক এবং নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পরে ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল বা নেতার স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে লোভী মেধাহীন একশ্রেণির তরুণ, যাদের এক বিরাট অংশ মূল রাজনৈতিক ধারায় সম্পৃক্ত হয়ে সংসদ, গণতন্ত্র, সংবিধান, জনগণ সবকিছুকেই ওদের হাতের খেলার বিষয় করে নিয়েছে। ফলে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, লুটপাট, ক্ষমতা দখলের অসুস্থ প্রতিযোগিতা, প্রতিপক্ষকে খুন, গুম ইত্যাদি অপকর্ম উত্তরোত্তর বাড়ছে বৈ কমছে না।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান

দমনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সাময়িক সময়ের জন্যে গণ-আন্দোলনকে স্তব্ধ করে রাখা সম্ভব, কিন্তু মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেলে তখন অস্ত্রের শক্তি কাজে লাগে না। বিশেষ করে, মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জাতি তো কোনো প্রকার অন্যায়-অবিচারের কাছে খুব বেশিদিন মাথা নত করে থাকতে পারে না। তাই, স্বৈরশাসক, তাঁর দল ও বাহিনী এবং সরকারি আমলার ক্ষমতার আসুরিক দাপটের বিরুদ্ধে প্রথমদিকে দেশের মানুষ নির্বিকার ও নিশ্চুপ থাকলেও, খুব বেশিদিন নীরব ও নির্বিকার থাকেনি। স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। সরকারি বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালিয়েও দুর্বার গণ-আন্দোলনকে ঠেকাতে পারেনি।

হাসান আজিজুল হকের আমরা অপেক্ষা করছি গল্পগ্রন্থের শেষ গল্প "অচিন পাখি" নব্বই-এর গণ-আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে আসে মানুষ। মিছিল-স্লোগান-হরতালে প্রকম্পিত দেশ। শহরের এককোণে বস্তিসদৃশ বাসা নিয়ে থাকেন প্রাইমারি স্কুলের এক শিক্ষক। তার সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া ছেলে বাবুল না জেনে বা কিছুটা জেনেই সুযোগ পেলেই মিছিলে যোগ দেয়। ছেলের পাখি কেনার সখ দীর্ঘদিনের। আর্থিক সংকটের কারণে স্কুলমাস্টার পিতার পক্ষে তা পূরণ করা সম্ভব হয় না। অবশেষে একদিন মাসের বাকি দিন কিভাবে চলবে সে কথা ভুলে গিয়ে ছেলের সখের পাখি চন্দরা কিনে দেয়। ছোট্ট খাঁচায় নিজের শরীরের সংস্থান হয় না বলে চন্দরা ভীষণ অস্থির আর ছটফট করে। বড়ো খাঁচা কিনে আনার পরে দেখা যায় অস্থিরতা আরো বেড়ে গেছে। বন্দি পাখিটির চোখে-মুখে-আচরণে মুক্তির প্রবল তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণা প্রবলভাবে আলোড়িত করে স্কুলমাস্টারকে। পাখিটির মতোই তিনি ভয়ানক অস্থিরতা আর অক্ষমতার যন্ত্রণায় ছটফট করেন।

> অস্থির হয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসি আমি। বিশাল মিছিল আসছে, মিছিলের মাথা উঠেছে আকাশে, বজ্রগর্জনের মতো চিৎকার আসছে, স্বৈরাচার নিপাত যাক। হঠাৎ খেয়াল করি, খোঁচা খাওয়া সাপের মতো হিসহিসিয়ে আমি বলছি, সব গুঁড়ো করে ফেলবো—চুরমার করে দেব সব। (হাসান, ১৯৯৫ : ৯৪)

পাখিটির মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান দেখিয়ে স্কুলমাস্টার খাঁচার মুখ খুলে দেন। কিন্তু পাখিটি আর খাঁচা থেকে বেরোতে চায় না। বনের পাখি খাঁচা ছেড়ে যেতে চায় না। স্কুলমাস্টার ভাবেন, পাখিটি কি তবে উড়তেই ভুলে গেছে! পরাধীনতার গ্লানি থেকে পাখিটি কি মুক্তি চায় না? 'পাখি কি আকাশ ভুলে যায়? হাজার হাজার মাইল মাঠ প্রান্তর অরণ্য নদী পাহাড় পেরিয়ে যাবার সুতীব্র গতি যার ছোট্টো হালকা দেহে বাঁধা আছে, সে কি আটকা পড়ে থাকবে ঐটুকু খাঁচায়।' (হাসান, ১৯৯৫ : ৯৫)

দেড় দশকের অধিক সময় সামরিক শাসন ও স্বৈরশাসন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে খাঁচার বন্দি পাখিটির মতোই পরাধীন করে রেখেছিল। মুক্তির জন্য বিপ্লব করার শক্তি ও সাহস হরণ করার চেষ্টা চালিয়েছে। ''সাক্ষাৎকার'' গল্পে সূর্যাস্তপ্রেমী এক নিরীহ মানুষকে রিমান্ডে নিয়ে স্বৈরশাসকের গোয়েন্দারা যে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল—চলনে বলনে, ওঠাবসায, খাওয়া-শোওয়া-ঘুমানো অর্থাৎ কোনো আচরণের মধ্যে সরকারি কোনো কাজের

বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা যাবে না; এর ব্যত্যয় ঘটলে রিমান্ডের নামে টর্চার সেলে নিয়ে হত্যা করা হবে। এসব থেকে প্রতীয়মান হয়, স্বৈরশাসক বা সামরিক শাসক জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে স্থায়ীভাবে তাদের পঙ্গু করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি। নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনকে কোনোভাবেই ঠেকাতে পারেনি স্বৈরশাসক। দেখা যায়, পাখিটি একদিন ঠিকই উড়ে যায়, যখন ছেলে বাবুলের লাশ বাড়িতে পৌঁছায়। মিছিলে চালানো গুলিতে বাবুলের বুকের দরজা খুলে গেলে প্রাণপাখি উড়ে যায় সেই আকাশে যেখানে উড়ে গেছে খাঁচার পাখিটা। দুটি ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর বন্দিত্বের ট্রাজেডি এক ও অভিন্ন হয়ে একটিমাত্র বিন্দুতে এসে মিশে গেছে।

উপসংহার

ষাটের দশক থেকে হাসান আজিজুল হক পাকিস্তানি শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংঘবদ্ধ শক্তির উদ্বোধনের যে আকাঙ্ক্ষাকে লালন করে আসছেন, মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষাকে ফলবান হতে দেখেছিলেন, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা পুনরায় ফেরত আসে। কিন্তু এবার শত্রু আর বিদেশি নয়। তাই এই পর্বের গল্পে হাসান আজিজুল হকের আক্রমণের জায়গাগুলো স্বতন্ত্র। সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণের মদমত্ততাকে তিনি অত্যন্ত কঠিন ভাষায় আক্রমণ করেন। সামরিক শাসকের ক্ষমতাকে স্থায়ী করার রাজনৈতিক অভিলাষ, সংবিধান পরিবর্তন, দুর্নীতিবাজ, জেলফেরত আসামি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী ব্যক্তি ও যুবমাস্তানবাহিনী নিয়ে দলগঠন, সরকারের আমলাদের ক্ষমতার অপব্যবহার, সরকারি প্রকল্পের নামে শ্রমজীবী মানুষের সাথে প্রতারণা, গ্রামের শাসন ও অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া, সরকারের বাহিনী ব্যবহার করে নৃশংসভাবে জনগণের কণ্ঠরোধ করা ইত্যাদি গল্পের বিষয় করার মধ্য দিয়ে হাসান আজিজুল হক তাঁর ক্রোধ ও হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি দেশ ও মানুষের বাস্তব চেহারা উন্মোচনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি সামরিক শাসক ও বাংলাদেশের সামরিক শাসকের মধ্যে অভেদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং উদ্দিষ্ট অভিঘাতের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাকামী মানুষের শক্তিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন।

গ্রন্থপঞ্জি

আবু জাফর, ১৯৯৬। *হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজবাস্তবতা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ১৯৯৯। *অন্য ঘরে অন্য স্বর, রচনাসমগ্র ১*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আহমাদ মোস্তফা কামাল, ২০১১। *সাক্ষাৎকার*। *উন্মোচিত হাসান : হাসান আজিজুল হকের আলাপচারিতা* [সম্পা. হায়াৎ মামুদ], ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা। পৃ. ৩১-৪৪

শাহাদুজ্জামান, ২০১১। *সাক্ষাৎকার*। *উন্মোচিত হাসান : হাসান আজিজুল হকের আলাপচারিতা* [সম্পা. হায়াৎ মামুদ], ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা। পৃ. ২১৯-২৪২

হাসান আজিজুল হক, ১৯৮৫। *পাতালে হাসপাতালে*। মুক্তধারা, ঢাকা।

হাসান আজিজুল হক, ১৯৯৫। *আমরা অপেক্ষা করছি*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

হাসান আজিজুল হক, ২০০৭। *বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প। সময়, ঢাকা।*